নতুন ভ্যাট আইন দরিদ্রদের উপর **কষাঘাত**

আগামী বাজেটে কালো টাকা ও অর্থ পাচার রোধে কর্যকর পদক্ষেপের ঘোষণা চাই

ক. প্রেক্ষাপট

সরকার আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য সম্ভাব্য ৪ লাখ ৩০০ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করতে যাচ্ছে, যা চলতি ২০১৬-১৭ বছরের বাজেটের তুলনায় ১৮% বেশি। এ ছাড়া আগামী অর্থবছরে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হবে ২ লাখ ৮৩ হাজার কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আকার করা হবে ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের ন্যায় আগামী অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি ধরা হবে মোট জিডিপির ৫.৪%। এই ঘাটতি মোকাবেলা করার জন্য সরকারকে বৈদেশিক ঋণ, অভ্যন্তরীণ উৎস (রাজস্ব ও অন্যান্য), ব্যাংক ঋণ এবং সঞ্চয়পত্র ও বন্ড বিক্রির উপর নির্ভর করতে হয়। এতে করে সুদ পরিশোধের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। প্রতিবছর সরকার রাজস্ব আদায়ের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে থাকে, তা কখনও অর্জন করতে পারে না। অর্থমন্ত্রী নতুন বাজেটে যে রাজস্বনীতি ঘোষণা করতে যাচ্ছেন, তাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) পরামর্শ বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। যেমন ভ্যাট হার বাড়ানো, ভর্তুকি কমানো, আমদানি শুল্ক কমানো ইত্যাদি। এই ভর্তুকি কমানো হলে কৃষি সহ অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে, এর প্রভাব হিসেবে সকল ভোগ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এতে করে দেশে বিদেশি পণ্যের আধিপত্য বেড়ে যাবে এবং দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। অন্যদিকে নতুন ভ্যাট আইনসহ অন্যান্য করের হার ও এর পরিধি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ফলে সকল মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র ভোক্তা শ্রেণীকে কর দিতে হবে। অতএব একদিকে জনগণের কাঁধে যেমন করের বোঝা চাপানো হচ্ছে, তেমনি ভর্তুকি কমিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রা ব্যয় আরও বেশি বাড়ানো হচ্ছে। সুতরাং কর আদায়ে সরকারকে কৌশলী হতে হবে এবং কর ন্যায্যতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ সরকারকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সম্পদ সংগ্রহ ও তা পুনঃবণ্টণনকারীর ভূমিকা নিতে হবে। সেক্ষেত্রে ধনীব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশী কর আদায় করতে হবে এবং এর অর্থ সাধারণ ও গরিব জনগণের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে। বিশেষ করে খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, পানি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সেবায় বরাদ্দ বাড়িয়ে এদের জীবন যাত্রা মানের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

খ. রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি এবং অর্থ পাচার বড় বাধা

১. অপ্রদর্শিত অর্থের রাজনৈতিক অর্থনীতি:

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় ব্যবস্থাপনার অন্যতম দুর্বল ভিত্তি হচ্ছে অপ্রদর্শিত অর্থনীতি বা **Under Ground Economy.** সরকার এই অপ্রদর্শিত অর্থনীতি কিভাবে মোকাবেলা করবে তার তার ফলপ্রসূ কোন উদ্যোগ না নিয়ে বরং প্রতি বছর বাজেটের পূর্বে অথবা বাজেটের পরবর্তী সময়ে কর আদায়ের নামে এ সকল অনৈতিক ব্যবসায়ীদেরকে কালো টাকা সাদা করার সুযোগ দিচ্ছে। এতে করে রাজস্ব ব্যবস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের দুর্নীতি এবং আর্থিক অনিয়মকে উৎসাহিত করার প্রয়াস সৃষ্টি হচ্ছে যা অপ্রদর্শিত অর্থনৈতিক কার্যকলাপের আরও বিস্তার ঘটাতে সহায়ক হবে এবং এতে করে প্রকৃত করপ্রদানকারীরা নিরুৎসাহিত হচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ পরিচালিত পৃথক গবেষণায় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির পরিমাণ মোট জিডিপি'র ৪৮% হতে ৮৪% পর্যন্ত উল্লেখ করা হয়েছে। এর গড় হার বিবেচনা করলে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছায়া অর্থনীতির পরিমাণ ছিল ১১,০৭০বিলিয়ন টাকা এবং যা উক্ত বছরের জাতীয় বাজেটের ৩২৭ শতাংশ। এক্ষেত্রে যদি কালো অর্থনৈতিক কার্যাবলীসমূহকে উন্মোচন করা যায় তাহলে একদিকে যেমন জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে, তেমনি

ভর্তুকি কমানো হলে কৃষি সহ অন্যান্য শিল্পের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাবে, এর প্রভাব হিসেবে সকল ভোগ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাবে। এতে করে দেশে বিদেশি পণ্যের আধিপত্য বেড়ে যাবে এবং দেশীয় শিল্পের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে।

অন্যদিকে উম্মোচিত অর্থনীতির কারণে প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব আদায় হারও কাঙ্ক্ষিত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকবে। এ কর্মকাণ্ডের প্রভাবে সরকারের ঘাটতি বাজেটের আশংকা হ্রাস পাবে এবং পাশাপাশি দেশি-বিদেশি ঋণ গ্রহণের ঝুঁকিও কমতে পারে।

২. Global Financial Integrity (GFI) এর মে-২০১৭ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৯১১ কোটি ডলার পাচার হয়েছে, যা প্রায় ৭২ হাজার ৮৭২ কোটি টাকা যা চলতি অর্থবছরের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) খাতে আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার (৭২ হাজার ৭৬৪ কোটি টাকা) চেয়েও সামান্য বেশি এবং পাচার হওয়া এ অর্থ দিয়ে বাংলাদেশে দুটি পদ্মা সেতু তৈরি করা সম্ভব। সুতরাং কেবল অর্থ পাচার ঠেকাতে পারলেই মূসক খাতের আয় নিয়ে আদৌ কোন দুশ্চিন্তা করতে হতো না এনবিআরকে। তা ছাড়া এই অর্থ চলতি অর্থবছরের পরিবহন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, কৃষি ও পানিসম্পদ খাতের মোট

কালো টাকা সাদা (কোটিতে)	
১৯৭১-৭৫	২.২৫
১৯৭৬-৮০	৫০.৭৬
১৯৮১-৯০	৪৫.৮৯
১৯৯১-৯৬	১৫০.৭৯
১৯৯৭-০০	৯৫০.৪১
২০০১-০৬	৮২৭.৭৪
২০০৭-০৮	৯,৬৮২.৯৯
২০০৯-১৩	২,০৯৮.০১
২০১৩-১৪	৪৪১.০০
২০১৪-১৫	৬৭৬.০০

সূত্র: এনবিআর

উন্নয়ন বাজেটের সমান। ২০০৫-২০১৪ এই দশ বছরে আমদানি-রপ্তানির সময়ে পণ্যের প্রকৃত মূল্য গোপন, বিল কারচুপি, ঘুষ, দুর্নীতি, আয়কর গোপন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে পাচার হয়েছে ৭ হাজার ৫৮৫ কোটি ডলার বা ৬ লাখ ৬ হাজার ৮৬৮ কোটি টাকা, যা প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭.৫ বিলিয়ন ডলার (৬০,৮৬৮ কোটি টাকা)। এই অর্থ দিয়ে অর্থমন্ত্রী প্রায় দুই অর্থবছরের বাজেট তৈরি করতে পারতেন। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র ২০১৩ সালে এর পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ যা ৭৭,৬০০ কোটি টাকা (৯.৭ বিলিয়ন ডলার), যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বৈদেশিক অনুদানের ১২ গুণেরও বেশি এবং বৈদেশিক ঋণের ১৪১% বেশি। পাচারের এই আশংকাজনক উর্ধ্বগতির কারণে দেশে পরিকল্পিত ও কাঙ্ক্ষিত বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থানের সংকট দেখা দিচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। পাশাপাশি সরকারকেও তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সম্পদ ঘাটতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। লক্ষণীয় যে, এই ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সরকার ভ্যাটের মতো পরোক্ষ করের বোঝা দরিদ্র জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। অর্থ পাচার রোধে সরকার যদিও এক্ষেত্রে কিছু নীতিমালা করছে, কিন্তু এর সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের অভাবে দেশ থেকে অর্থ পাচার রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না। দুঃখজনক হচ্ছে, এশিয়ার বিভিন্ন প্রতিবেশী দেশের মধ্যে তুলনামূলক বেশি অর্থ পাচার বাংলাদেশ থেকেই হয়। [প্রথম আলো: ০৩/০৫/২০১৭]

৩. সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৪' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০১৪ সাল শেষে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশিদের অন্তত ৫০.৬০ কোটি সুইস ফ্রাঁ (৪,৫৫৪ কোটি টাকা) গচ্ছিত রয়েছে এবং এই গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ এক বছরের ব্যবধানে ৪২.৭২% (১,৩১৮ কোটি টাকা) বেড়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, কয়েক বছর ধরে মোট জিডিপি'র তুলনায় বিনিয়োগের যে হার রয়েছে, তার চেয়ে সঞ্চয়ের হার বেশি। ভারত, আমেরিকাসহ অন্যান্য দেশের সাথে তথ্য আদান-প্রদান সংক্রান্ত চুক্তি থাকায় সে সকল দেশ হতে সুইস ব্যাংকগুলোয় টাকা পাচার অনেকাংশে কমে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, সুইস সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে এধরনের চুক্তির কথা বলা হলেও তা এখন পর্যন্ত সম্পাদন করা হয়নি।

॥ মালয়েশিয়ায় ২০০২ সালে "মাই সেকেন্ড হোম প্রোগ্রাম" MM2H চালুর পর থেকে ডিসেম্বর ২০১৬ জুন পর্যন্ত মোট ৩৪৯৩জন বাংলাদেশি "সেকেন্ড হোম" সুবিধা নিয়েছে। MM2H রিপোর্ট অনুযায়ী এই পাচারের ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ ১০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য় এবং ১ম ও ২য় অবস্থানে আছে চীন ও জাপান (www.mm2h.gov.my/index.php)। উল্লেখ্য যে, গত এক দশকে "সেকেন্ড হোম" প্যাকেজ বাবদ ৬,০০০ কোটি টাকা এবং সরাসরি প্লট বা ফ্ল্যাট কেনা বাবদ ৪,০০০ কোটি টাকা পাচার হয়েছে। এসব অর্থ পণ্যের আমদানি-রফতানি, রেমিটেন্স ও হুন্ডির মাধ্যমে সে দেশে পাচার হয়েছে। [আমাদের বুধবার: ২৮/১০/২০১৪]

॥ কানাডার একটি স্থান 'বেগম নগর' হিসেবে পরিচিত পেয়েছে এবং কানাডায় ১.১০কোটি টাকা দিলেই পাওয়া যায় নাগরিকত্ব। সেখানে অনেক ধনী এ নাগরিকত্ব কিনে তাদের বেগম, ছেলেমেয়ে ও বাড়ি-সম্পত্তিসহ সেখানে রেখে দিয়েছেন। বাংলাদেশ হতে ১৯৭৬ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ঐ দেশে অর্থ পাচার হয়েছে প্রায় ২লক্ষ কোটি টাকা, যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ৬%

বিভিন্ন সময়ে সুইস ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশীদের গচ্ছিত টাকা

সাল	গচ্ছিত সুইস ফ্রাঁ হিসেবে	গচ্ছিত টাকা হিসেবে
২০১৪	৫০.৬০ কোটি	৪,৫৫৪ কোটি
২০১৩	৩৫.১৯ কোটি	৩,২৩৫ কোটি
২০১২	২২.৮৯ কোটি	১,৯০৮ কোটি
২০১১	১৫.২৩ কোটি	১,২৯৫ কোটি
২০১০	২৩.৬০ কোটি	১, ৯৬৮ কোটি
২০০৯	১৪.৯০ কোটি	১,২৪১ কোটি
২০০৮	১০.৭০ কোটি	৮৯২ কোটি

সূত্র: সুইস ন্যাশনাল ব্যাংক (এসএনবি) কর্তৃক প্রকাশিত 'ব্যাংকস ইন সুইজারল্যান্ড ২০১৪' শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন

বোর্শ। [প্রথম আলো: ২৬/০৫/২০১৩]

॥ নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা ও ফরেস্ট হিলস এলাকায় প্রায় ২ মিলিয়ন ডলার নগদ পরিশোধে তিনটি বাড়ির মালিক হয়েছেন বাংলাদেশের জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশনের একজন ইকনোমিক মিনিস্টারের স্ত্রী। মাত্র তিন বছরের (২০১২-২০১৫) ব্যবধানে ঐ ইকনোমিক মিনিস্টারের স্ত্রী প্রায় তিন মিলিয়ন ডলারের রিয়েল এস্টেট সম্পদের মালিক হন। [বিডি-প্রতিদিন: ১১/০২/২০১৬]

৫. অফশোর ব্যাংকিংয়ের আড়ালে ৩৪০ কোটি টাকা পাচার:

বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে মতে, বেসরকারি খাতের এবি ব্যাংকের অফশোর ইউনিটের মাধ্যমে চার বিদেশি কোম্পানির নামে ৪ কোটি ২৫লাখ ৪০হাজার ডলার (৩৪০কোটি টাকা) পাচার করেছে। যে উদ্দেশ্যে এসব ঋণ নেওয়া হয়েছিল তা ব্যবহার না করে এই ঋণের অর্থ অন্য হিসাবে সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাচার হয়েছে। 'পানামা পেপারস' নামে অর্থ পাচারের যে ঘটনা ফাঁস করা হয়েছে, তা মূলত অফশোর ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমেই ঘটেছে। [প্রথম আলো: ২৬/০৪/২০১৬]

৬. বছরে ৩২,০০০ কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে বিদেশি কর্মীরা

অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে কর্মরত বিদেশিরা প্রতি বছর দেশ থেকে প্রায় ৪০০কোটি ডলার নিয়ে যাচ্ছেন, যা টাকার হিসাবে প্রায় ৩২,০০০কোটি টাকা। এ অর্থ বাংলাদেশের মোট রেমিট্যান্স আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং প্রতি বছর এর পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বর্তমানে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে বৈধভাবে যত বিদেশি কাজ করছেন, তার চেয়ে অবৈধের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি, যার সংখ্যা এক লাখও হতে পারে। অবৈধভাবে অনেক বিদেশি কর্মী বাংলাদেশে কাজ করে কোনো কর পরিশোধ ছাড়া তাদের টাকা অবৈধভাবে নিজ দেশে পাঠাচ্ছেন। মূলত: বাংলাদেশে প্রকৌশল, চিকিৎসা,

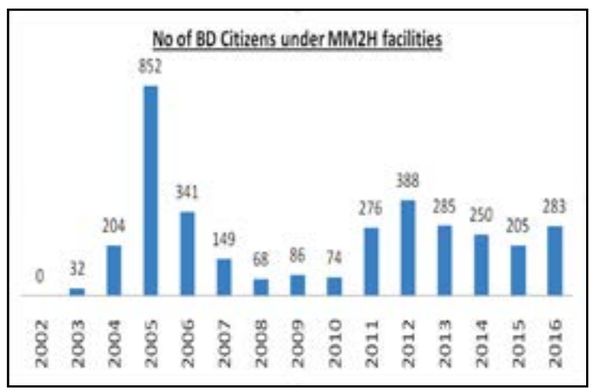

গার্মেন্ট, মার্চেন্ডাইজিং, শিল্প কারখানা ইত্যাদি খাতে বিদেশি পরামর্শকসহ দক্ষ কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন লোক কাজ করছেন। বিনিয়োগ বোর্ড এর তথ্য মতে বিদেশিদের জন্য সর্বোচ্চ ০৫ বছর পর্যন্ত ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হয়। ভ্রমণ/ব্যবসার ভিসা নিয়ে স্বল্প সময়ের জন্য অনেকে এদেশে এসে তাদের বড় একটি অংশ কাজ শেষে ফিরছেন না। মূলত তারাই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অবৈধভাবে কাজ করেন এবং তাদের আয়ও করের আওতায় আসছে না। [সমকাল: ২৭/০৩/২০১৬]

৭. রাষ্ট্রায়াত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে আত্মসাৎ:

২০১১ সাল থেকেই শেয়ার বাজার, সোনালী ও বেসিক ব্যাংকসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ব এবং বেসরকারি ব্যাংক থেকে প্রভাবশালীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় হলমার্ক, বিসমিল্লাহ গ্রুপসহ বিভিন্ন কোম্পানির হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের ঘটনা ঘটেছে। এনবিআর এর তথ্য মতে, শুধু সরকারি ব্যাংক (সোনালী, জনতা, রূপালী, অগ্রণী ও বেসিক ব্যাংক) হতে প্রায় ২০,০০০ কোটি টাকা লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী ব্যাংকের বিভিন্ন শাখা থেকেই প্রায় ১০,০০০কোটি টাকা লোপাটের ঘটনা ঘটেছে। ২০০৯ থেকে ২০১২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত আরেক ব্যাংক বেসিক ব্যাংক থেকে লুট হয়েছে প্রায় সাড়ে ৪,৩৬৮ কোটি টাকা (৫৬ কোটি ডলার)। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর দায়িত্বহীনভাবে ঋণদানের প্রবণতা ও খেলাপি ঋণগ্রহীতাদের পার পেয়ে যাওয়ার বড় কারণ হলো বাংলাদেশের ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক এলিটদের পারস্পরিক আঁতাত ও প্রভাব। [আমাদের বুধবার: ২৫/০৩/২০১৫, ১৯/০৮/২০১৫, বণিক বার্তা ১২/০৪/২০১৬]

গ. নতুন ভ্যাট আইন গরিব মানুষের জন্য নিবর্তনমূলক ঃ

১. আগামী ১ জুলাই ২০১৭ থেকে নতুন মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন করা হবে। এতে ট্যারিফ লাইনের প্রায় ৭৫% পণ্যের আমদানি কিংবা উৎপাদন, সরবরাহ ও বিক্রি সহ সকল পর্যায়ে একক হার হিসেবে ১৫% মূসক আরোপিত হবে, ফলে ৪,৮১৬ ধরনের পণ্যের ওপর ১৫% হারে মূসক বসবে এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় বহু জিনিসপত্র ও সেবায় ভোক্তা পর্যায়ে ব্যয় বেড়ে যাবে। যেমন দেশি ব্র্যান্ডের কাপড়চোপড়, ভোজ্যতেল, চিনি, সুপার শপ, নির্মাণসামগ্রীর রড, গ্যাস, বিদ্যুৎ বিল, সোনার গয়না ইত্যাদি ব্যয় বেড়ে যাবে। 'নিত্য প্রয়োজনীয় উপাদান গ্যাস-বিদ্যুতের ওপর বর্তমানে ৫% মূসক আছে এবং নতুন আইনে সেটি ১৫% হলে সেটি ভোক্তা ও উৎপাদক পর্যায়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এতে সীমিত আয়ের, বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সংসার খরচও বাড়বে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম কমলেও সরকার তেলের দাম তো কমাচ্ছেই না, উল্টো তেল ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের দাম আরও বাড়াচ্ছে। জ্বালানি তেলসহ গ্যাস-বিদ্যুতের দাম কমা মানে সব পণ্যের উৎপাদন খরচ কমে আসা। তাতে অর্থনীতিতে যেমন ইতিবাচক প্রভাব পড়বে, তেমনি জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও বাড়বে। তখন তেল-গ্যাস-বিদ্যুৎ থেকে যে মূসক সরকার আদায় করত, তা ক্রেতাদের অন্যান্য কেনাকাটা থেকেই আদায় করা সম্ভব হবে।

২. মূলত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্ত মেনেই নতুন এই মূসক আইন তৈরি করা হয়। ২০১২ সালে বাংলাদেশকে বর্ধিত ঋণ সহায়তার (ইসিএফ) প্রায় ১০০ কোটি ডলার অনুমোদন করে আইএমএফ। এই ঋণ পাওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল নতুন মূসক আইন করা। প্রত্যক্ষ কর আদায় বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানী ও ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কর আদায় তুলনামূলক ভাবে কঠিন হওয়ায় অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের সহজ হাতিয়ার হিসেবে প্রত্যক্ষ কর না বাড়িয়ে পরোক্ষকর তথা ভ্যাটের হার এবং এর আওতা বাড়ানো হয়েছে। এতে সাধারণ মানুষের ওপর বোঝা বাড়বে এবং ধনী ও গরিবের মধ্যে আয় বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাবে। পরোক্ষ কর সবসময় গরীব ও সাধারন মানুয়ের জন্য নিবর্তন মূলক। ভ্যাট আরোপের বিষয়টি সরকারকে অর্থনৈতিক এবং কর ন্যায্যতার দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং সেক্ষেত্রে ধনীদের ভোগ্য পণ্যের উপর ক্রমবর্ধমান হারে ভ্যাট আরোপ করতে হবে এবং দরিদ্র মানুষের ভোগ্য পণ্যের উপর কোন প্রকার ভ্যাট আরোপ করা উচিৎ হবে না।

৩. দক্ষিণ এশিয়ায় অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশেই ভ্যাটের হার সবচেয়ে বেশি এবং এর হার সব ক্ষেত্রেই ১৫%। ভারতে মূসক হার সাড়ে ১২%, নেপালে ১৩%, মালদ্বীপ ও ভুটানে মূসক না থাকলেও গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্স (জিএসটি) আছে। মালদ্বীপে সব ক্ষেত্রে ৬ শতাংশ এবং পর্যটন খাতে ১২% জিএসটি আরোপ হয়। বাংলাদেশের প্রতিযোগী অর্থনীতির দেশ ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মিয়ানমারে মূসকের হার ১০%। প্রতিটি দেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কথা বিবেচনা করে তাদের ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যসমূহ করমুক্ত রাখা হলেও বাংলাদেশে এই চিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। বাংলাদেশের সরকার দরিদ্র মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল পণ্যের উপর ভ্যাট আরোপ করেছে।

৪. ভ্যাট সম্পর্কিত প্রভাব মূল্যায়নের উপর IFS (Institute of Fiscal Study-UK) এর এক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে যে, পরোক্ষ কর সব সময়ই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দমনমূলক (Regressive), কারণ এই ধরনের কর উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে অব্যাহতভাবে আঘাত করে এবং তাদের উন্নয়নের পথকে অনেকাংশেই রুদ্ধ করে দেয়। কারণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের আয়ের অধিকাংশ অংশই খরচ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ক্রয়ের পেছনে ফলে ধনীদের তুলনায় আনুপাতিক হারে দরিদ্রদের উপর কর ভারও বেশি পরে। তারা গবেষণা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে, যুক্তরাজ্যে ভ্যাট আরোপের ফলে ধনীদের তুলনায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভ্যাট প্রদানের হার প্রায় দ্বিগুন।

ঘ. বহুজাতিক কোম্পানী প্রকৃত কর দেয়না ঃ

১. সিম বদলের নামে নতুন সিম বিক্রির মাধ্যমে গ্রামীণফোন,

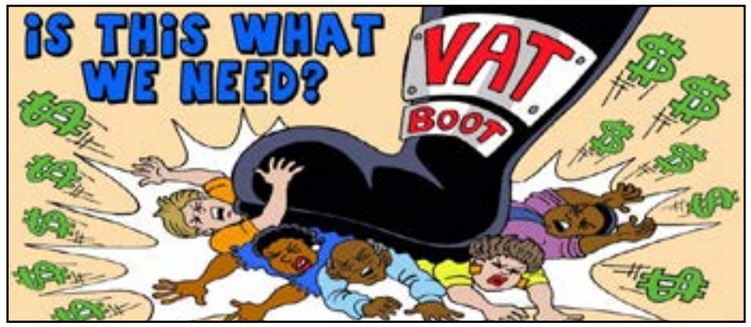

বাংলালিংক, এয়ারটেল ও রবি প্রায় এক হাজার ২০০ কোটি টাকার ভ্যাট ফাঁকি দিয়েছে বলে ধারণা করছে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (এলটিইউ-ভ্যাট)। ২০১১ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ বছরে মোবাইল ফোনের সিম পরিবর্তনের নামে নতুন সিম বিক্রির মাধ্যমে এই ফাঁকি দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে ২০০৭ থেকে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে একইভাবে সিম পরিবর্তনের নামে ৩,১০০ কোটি টাকার ফাঁকি চিহ্নিত করেছে এনবিআর। ফোন কোম্পানিগুলো মোটা অঙ্কের ব্যবসা করলেও সরকারের প্রযোজ্য রাজস্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিয়ম করছে। এনবিআর-এ প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও লোকবলের অভাবে সব অনিয়ম ধরতে না পারায় বছরের পর বছর ধরে তারা কৌশলে এ কাজ করে যাচ্ছে। [ইত্তেফাক, ১১/০৪/২০১৭]

২. ঠিক একইভাবে "ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ কোম্পানি লিঃ (বিএটিবি" যুক্তরাজ্যে অবস্থিত বিএটি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের কাছ থেকে কারিগরি ও পরামর্শসেবা নিয়ে থাকে এবং এ সেবার নামে ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের মাধ্যমে প্রতি বছর বড় অংকের অর্থ হোল্ডিং কোম্পানিতে পাঠাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। গত নয় বছরে এ ধরনের সেবার ফি বাবদ ৬১৫ কোটি টাকার বেশি সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করেছে বিএটিবি। অর্থাৎ কারিগরি ও পরামর্শ ফি বাবদ প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৭০ কোটি টাকা পরিশোধ করছে প্রতিষ্ঠানটি। বিএটিবির নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০১৫ সালে কারিগরি ও পরামর্শ ফির নামে বিএটি ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডের সেবামূল্য দাঁড়িয়েছে ৯৭.৮১কোটি টাকা। এর পূর্বেও কোম্পানীটি তাদের দু'টি ব্র্যান্ডের সিগারেটে মূল্যস্তরে মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ১,৯২৪ কোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেয়। সরকার এদেরকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করলে বিপুল পরিমাণ প্রত্যক্ষ কর আদায় হতো, ফলে ভ্যাটের মত পরোক্ষ করের উপর সরকারকে এতটা নির্ভরশীল হতে হতো না। [বণিকবার্তা, ১৩/১১/২০১৬]

ঙ. কালো টাকা পাচার রোধে ভারত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ:

১. অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ:

২০১২ সালের মে মাসে ভারত সরকার অপ্রদর্শিত অর্থনীতির উপর শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। ভারত আন্ত:দেশ ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ৮৮টি দেশের সাথে DTAAs (Double Taxation Avoidance Agreement) চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং তথ্যের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ২২টি দেশের সাথে TIEAs (Tax Information Exchange Agreement) চুক্তি সম্পাদন সম্পাদন করেছে। এর ফলে ভারত ২০০২-২০১২ এই ১০বছরে পাচারকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় ১১৭ হাজার কোটি রুপি রাজস্ব আদায় করে।

২. বিদেশে পাচারকৃত কালো টাকা সংক্রান্ত আইনী পদক্ষেপ:

বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে ভারত সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করেছে। এই আইনটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো:

॥ বৈদেশিক সম্পদের ক্ষেত্রে আয় এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে ১০ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান

॥ এই ধরনের অপরাধ মীমাংসার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিরা অভিযোগ মীমাংসার জন্য Settlement Commission এর কাছে যেতে পারবেন না।

॥ আয় বা সম্পদের তথ্য গোপন করলে আয় বা সম্পদের উপর ৩০০% কর আরোপ করা হবে।

॥ আয়কর রিটার্ন জমা না দিলে বা এতে বৈদেশিক সম্পদ সম্পর্কে ভুল তথ্য দিলে ৭বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান

৩. অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কালো টাকা প্রতিরোধে আইনী পদক্ষেপ:

দেশের ভিতরে কালো টাকার বিস্তার প্রতিরোধে বেনামী লেনদেন নিষিদ্ধ বিল নামে একটি আইন পাশ হয়েছে এবং তা হলো,

॥ সরকার ধারণা করছে যে, এই আইন বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মাধ্যমে, বিশেষ করে আবাসন খাতে বেনামী সম্পদের মাধ্যমে কালো টাকা অর্জনের একটি বড় পথ বন্ধ করা সম্ভব হবে। মূল মালিকের পরিবর্তে অন্য আরেকজনের নামে সম্পদ করা বা রাখাকেই বেনামী সম্পদ হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে। প্রস্তাবিত আইনে এসব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কথা বলা হয়েছে।

॥ ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার ক্ষেত্রে Personal Identification Number (PIN) থাকা বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। আর এ ধরনের কেনাকাটার ক্ষেত্রে নগত লেনদেনও নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

॥ আইন বাস্তবায়ন জোরালো করতে, Centre Board of Taxes এবং Central Board of Excise and Custom কারিগরি দক্ষতা বাড়াবে এবং পরস্পরের তথ্যভাণ্ডার ব্যবহার করবে।

৪. কালো টাকা প্রতিরোধে ৫০০ ও ১০০০ রুপি নোট বাতিল পদক্ষেপ:

ভারত সরকার সম্প্রতি কালো টাকার বিস্তার রোধে পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০রুপি নোট বাতিলের ঘোষণা দিয়ে ব্যাংক হতে তার পরিবর্তে নতুন ৫০০ ও ১০০০রুপি নোট সংগ্রহের ঘোষণা দেয় এবং এর জন্য সময় বেধে দেয়া হয় ৫০দিন। অন্যথায় সকল পুরাতন নোট বাতিল বলে গণ্য হবে। শর্ত থাকে যে, যে পরিমাণ পুরাতন নোট পরিবর্তনের জন্য আনা হবে তার আয়ের বৈধ দলিল-দস্তাবেজ ব্যাংকে উপস্থাপন করতে হবে। এতে করে ঐ সময়কালের মধ্যে অনেকেই এর হিসেব দিতে পারে নাই এবং পুরোনো ৫০০ এবং ১০০০রুপির অগণিত নোট বাতিল হয়ে যায়। এভাবে ইন্ডিয়া সরকার অপ্রদর্শিত অর্থ বা কালো টাকার বিস্তার রোধে একটি কার্যকর ভুমিকা রাখে।

চ. আমাদের প্রস্তাবনা

১. বাংলাদেশী নাগরিকদের বা কোন দ্বৈত নাগরিকত্ব সম্পন্ন বাংলাদেশীদের বিদেশে সম্পদ ও ব্যাংক একাউন্ট থাকলে তাকে ফি-বছর বিবরণী বাংলাদেশে দিতে হবে। তথ্য গোপন ও কর ফাঁকি দিলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

২. মালয়েশিয়া সহ বিভিন্ন দেশে যেসব বাংলাদেশী নাগরিক নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছে, তাদের সকল অর্থনৈতিক তথ্য পরীক্ষা করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৩. সুইজারল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের সাথে ব্যাংক লেনদেনের স্বচ্ছতার উপর আন্ত-দেশীয় চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

৪. পনামা পেপারস-এ যেসব বাংলাদেশীদের নাম এসেছে, তাদের ব্যাপারে তদন্ত ও শ্বেতপত্র চাই।

৫. আইনগত শাস্তির বিধান রেখে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচার বন্ধ করতে হবে। কোন সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠালে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে।

৬. সকল ক্ষেত্রে জাতীয় শুদ্ধাচার নীতির পূর্ন বাস্তবায়ন চাই।

৭. বেনামী সম্পদ কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের পথ অনুসরণ করে আইন প্রণয়ন করতে হবে। যেমন,

॥ ২০০০ ডলারের উপর যেকোনও কেনাকাটার চওঘ ব্যবহার এবং এ ক্ষেত্রে নগদ লেনদেনও নিষিদ্ধ করা

॥ ধরা পড়লে বেনামী সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা

৮. হলমার্ক, বিসমিল্লা গ্রুপ, বিভিন্ন রাষ্ট্রায়াত্ত্ব ও বেসরকারি ব্যাংক সহ শেয়ার বাজার কেলেংকারীর আত্মসাতকৃত টাকাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির উপর তদন্ত কমিশন ও শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে।

৯. বহুজাতিক কোম্পানি গুলো বিভিন্ন পন্থায় প্রকৃত আয় গোপন করে বিদেশে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। বিশেষ করে মিস ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থ পাচার করে থাকে। এই কোম্পানি গুলো দেশে কত টাকা বিনিয়োগ বা আয় করলো তা অডিট করে এর রিপোর্ট জনসম্মুখে প্রকাশ করতে হবে। পাশাপাশি এনবিআর-কে প্রদেয় তথ্যের সত্যতা যাচাই করতে হবে। সরকার এক্ষেত্রে ট্রান্সফার প্রাইসিং আইন করেছে এবং একটা ইউনিট স্থাপন করেছে, যার প্রধান কাজ হচ্ছে উপরোক্ত বিষয়গুলো উদঘাটন করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা এই ইউনিটের কর্মতৎপরতা দেখতে পাচ্ছিনা। আমরা এই ট্রান্সফার প্রাইসিং ইউনিটের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে জানতে চাই।

১০. সবার উপর দেশের সকল রাজনৈতিক শক্তিকে একটি ন্যুনতম সমঝোতা করতে হবে, যাতে দেশের পুজি ও কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা (যা মূলত আয় হয় বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিক এবং দেশে গরীব গার্মেন্টস শ্রমিক হতে) পাচারে কঠিন ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর্থিক খাত তথা ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ করে পাবলিক ব্যাংকিং সেক্টরে জনগনের প্রতি দায়বদ্ধতা তৈরি করতে হবে। সবার উপরে আমরা বিশ্বাস করি যে, সংঘাতপূর্ণ রাজনীতি (পরস্পরকে নি:শেষ করে দেবার রাজনীতি) পরিহার করে সবার ভেতরে বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের ভেতরে পূর্ণ নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ আচরণ ও আইনের শাসনের প্রতি পূর্ণ আস্থা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ দেশের অর্থ যেন বিদেশে স্থানান্তর না হয় সে জন্য দেশের ভেতরে বিনিয়োগবান্ধব ও শান্ত রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার পরিবেশ স্থাপন করতে হবে। যাতে করে দেশের ভেতর নিজের বৈধ অর্থ রাখতে ও বিনিয়োগ করতে সকলে স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপদ বোধ করে। এটা না হলে টাকা পাচার হতেই থাকবে এবং তার সাথে হতে থাকবে ব্রেন ডেন অর্থাৎ দেশের জ্ঞানী মেধাপূর্ন লোকজন শান্তি, মর্যাদা ও নিরাপত্তার আশায় দেশ ত্যাগ করবে।

১১. সংঘাতপূর্ণ রাজনীতির অপরিহার্য অংশ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে, বিশেষ করে গনমাধ্যম, নির্বাচন কমিশন, স্থানীয় সরকার, দুর্নীতি দমন কমিশন, স্বধীন ও শক্তিশালীভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়ে আইনের শাসন কায়েম কতে হবে।

১২. সরকার বিগত কয়েক বছর পূর্বেই একটি জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে। এই কৌশলপত্রের মূল লক্ষ্য হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের সকল স্তরকে দুর্নীতি মুক্ত করা। আমরা মনে করি তা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন এবং এর আলোকে সরকারের সকল বিভাগ, মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহে সংশ্লিষ্ট শুদ্ধাচার কৌশল প্রয়োগ ও বাস্থবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. বিদেশিদের চাপে ভর্তুকি না কমিয়ে সরকারি বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় খরচ কমিয়ে ঘাটতি সমন্বয় করতে হবে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য "Public Expebditure Review Commission" করতে হবে এবং সে অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় খরচ কমাতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ:
অনলাইন নলেজ সোসাইটি, অর্পণ, উদ্দীপন, উদয়ন বাংলাদেশ, উন্নয়ন ধারা ট্রাস্ট, এসডিও, কোস্ট ট্রাস্ট, জাতীয় কৃষাণী শ্রমিক সমিতি, জাতীয় শ্রমিক জোট, ডাক দিয়ে যাই, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা, পিএসআই, বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ কৃষক ফেডারেশন (জাই), বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি, বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশন, মুক্তির ডাক, লেবার রিসোর্স সেন্টার, সংগ্রাম, সিডিপি, হিউম্যানিটি ওয়াচ, সিনার্জি বাংলাদেশ, জ্ঞান অধ্যয়ন কেন্দ্র, ন্যাচার কেম্পেইন বাংলাদেশ, আলোক যাত্রা।

সচিবালয়: ইক্যুইটিবিডি, বাড়ি: ১৩ (মেট্রো মেলোডি), রোড়: ২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭।
যোগাযোগ: আহসানুল করিম বাবর (মোবাইল: ০১৭১৩৩২৮৮০০), মোস্তফা কামাল আকন্দ (মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১)

tax justice network

equitybd